সংখ্যালঘুতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান

সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে পূর্ববর্তী শাসক ও বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর পালিত গুণ্ডাদের মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে হারিয়ে যায় তাদের সব মুখরোচক স্লোগান: 'মিলেমিশে বসবাস' , 'দেশীয় শান্তি' , এবং 'জাতীয় ঐক্য' -যার শব্দদূষণে তারা আমাদের মাথা ধরিয়ে দিতো। ইসলামকে দূরে ফেলে সকলের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরী করার জন্য এ স্লোগানগুলোকে তারা সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তারা তাদের প্রথম পরীক্ষাতেই ব্যর্থ হয় এবং সিরিয়ান তাগুতের "রক্তহীন বিজয়" এর অর্জন রক্তের সাগরে ডুবে যায়!

ঘটনাগুলো আবারো প্রমাণ করে, দাওলাতুল ইসলাম-ই যথার্থ আচরণ করেছে এই কাফের ও মুরতাদ সম্প্রদায়গুলোর সাথে, যাদেরকে তারা সংখ্যালঘু নাম দিয়েছে। বাস্তবতা হলো, অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এরাই ইহুদী ও ক্রুসেইডার যোদ্ধাদের হাতিয়ার হয়ে কাজ করে আসছে। এদেরকে ব্যবহার করে ক্রুসেইডাররা ইসলামের দেশগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

ফ্রান্স যখন শামে আক্রমণ করে তখনই তারা আলাভী নুসাইরীদের জন্য "একটি রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা করে দেয়। যেন এদের থেকে কাঙ্ক্ষিত স্বার্থ হাসিল করা যায় এবং বিভক্তির রাজনীতিও চর্চা করা যায়।

আর নুসাইরীদের সাথে বিদ্বেষ পোষণকারী জনসাধারণের সাথে স্বাভাবিকভাবে মিশে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদেরকে "আলাভী" নামে প্রচার করে। এবং এতে তারা সফলতার মুখ দেখে যখন তৎকালীন আরবের জাতীয় মুফতী "আমীন আল-হুসান" এ বিষয়ে একটি দ্ব্যর্থবাচক ফতোয়া জারী করে। যা ২২ মুহাররম, ১৩৫৫ হিজরিতে "জারিদাতুশ শা'ব আদ-দামেশক্বিয়াহ" পত্রিকায় ছাপা হয়। সেখানে বলা হয়: "এই আলাভীরা মুসলিম... কারণ তারা উম্মাহর অংশ এবং তাদের দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো অভীন্ন! সেই আল-কুদসের মুফতির ফতোয়া থেকে আজকের "আল-কুদস অক্ষ" পর্যন্ত মুসলিমরা আলাভী নুসাইরীদের হাতে জবাই হচ্ছে।

সিরিয়ার নতুন সরকার এই নুসাইরি কাফের, ফাসেকদের সাথে এত তোষামোদ ও চাটুকারিতা করলো, তাদের থেকে "দুর্বৃত্ত" ট্যাগ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো, এবং তাদেরকে "অংশীদার, ভাই ও মুক্তস্বাধীন" হিসেবে বরণ করে নিলো। কিন্তু বিনিময়ে তারা প্রথম সুযোগেই সরকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্দয় ও নৃশংসভাবে সরকারী সেনাদেরকে হত্যা করে।

মাঠপর্যায়ে, ঘটনাগুলো বর্ণচোরা এই মুরতাদ বাহিনীর সামনে নিরাপত্তা ও সামরিক ব্যর্থতা তৈরী করেছে। ফলে তারা তাদের "জাতীয়তাবাদী শিক্ষা ও স্লোগান" থেকে বের হয়ে সংখ্যালঘুদের উপর "ক্ষমার" পরিবর্তে "গণহত্যা" চালায়! আর এদিকে তাদের কমান্ডাররা জনগণকে "মব জাস্টিস" আখ্যা দিয়ে ঘটনার দায়ভার জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়! যদিও প্রাথমিকভাবে তারা জনরোষের প্রসংশা করেছিলো, কিন্তু পরক্ষণে তারা জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিচারালয় দাড় করায় এবং "তদন্ত কমিটি" গঠনের ঘোষণা দেয়। যেন আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে নিজেদের দায় এড়িয়ে সে সকল বিদেশী যোদ্ধাদের ঘাড়ে দোষ চাপানো যায় -যারা সিরিয়ার নাগরিকত্ব পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। যদিও নতুন-পুরাতন উভয় সরকারের অলঙ্ঘনীয় সংবিধানে "সিরিয়ার নাগরিকত্ব আইনের" ধারা মোতাবেক তাদের এ সুযোগ নেই।

এদিকে বিপ্লবী মিডিয়াগুলো ঘটনার পিছনে বিদ্যমান নিরাপত্তা ইস্যু এবং ইরানী রাফেযি ও তার দোসরদের বিদেশী ভূমিকা নিয়ে বেশ সরব হলেও, তাদের কেউই এর শারীয়াহ ভিত্তিক কারণগুলো সামনে আনছে না। তবে জেনে

নেওয়া যাক, কি কি কারণে এমনটি হলো?

সংক্ষেপে বলতে গেলে এর মূল কারণ হলো, শামে তারা শরীয়াহ শাসন বাস্তবায়ন করেনি এবং ইসলামী রাষ্ট্রনীতিও অনুসরণ করেনি। বিশেষত "ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক নির্ণয় ও হুকুম প্রয়োগ"-এর ক্ষেত্রে তারা শরীয়াহর পরিবর্তে কুফরী সংবিধান ও জাহেলী আইন-কানুনের অনুসরণ করেছে। কেননা ইসলামে "সংখ্যালঘু" কিংবা "সংখ্যাগুরু" বলতে কিছু নেই। এগুলো সব নব্য জাহেলী বিভাজন যা এসেছে জাতিসংঘের সনদ, আন্তর্জাতিক আইনের ধারা ও অন্যান্য জাহেলী সংবিধান থেকে। ইসলাম মানুষকে কেবল দুই শ্রেণিতে ভাগ করে: মুসলিম ও কাফের। অতঃপর কাফেরদেরকে আবার চার শ্রেণিতে ভাগ করে: সামরিক (হারবী), যিম্মী, চুক্তিবদ্ধ ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। আর নুসাইরী আলাভীরা হলো একটি কাফের, মুরতাদ ও নিকৃষ্ট বাতেনী সম্প্রদায়, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত ছিলো, এখনো রয়েছে। এমনকি যে নব্য তাগুত তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ও নিরাপত্তা ঘোষণা করেছিলো তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছে এবং তার সৈনিকদেরকে রাস্তাঘাটে হত্যা করে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার যুদ্ধাংদেহী মনোভাব জানান দিয়েছে। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে এই নুসাইরী আলাভী -এবং অনুরূপ দ্রুজ- সম্প্রদায়ের ব্যাপারে ইসলামি হুকুম সম্পর্কে সুবিস্তার বর্ণনা এসেছে। একসময় "বিপ্লবী জিহাদীদের" বিভিন্ন লেখালেখিতেও নিয়মিত উঠে আসতো নুসাইরীদের সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও অন্যান্য ইমামদের ফতোয়াসমূহ। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাদের দ্বীন পরিবর্তন করে জাহিলিয়্যাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আলাভীদের সাথে মিলেমিশে সহাবস্থান করার চেষ্টা করে।

কাজেই, সংখ্যালঘু নামে যে পরিভাষার চর্চা হয়, ইসলাম তার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষকে দ্বীনের ভিত্তিতে বিচার করে; সংখ্যা, গোত্র, বংশ ইত্যাদির ভিত্তিতে নয়। একইভাবে ইসলাম কাফেরদের ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণিভেদে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে। একজন কাফের সামরিক কিংবা যিম্মী, যে শ্রেণির-ই হোক-না কেন, শরীয়াহ তার জন্য সম্পর্কের সীমারেখা নির্ধারণ করে রেখেছে।

তথাপি আজ মুরতাদরা ইসলামের বিধানগুলো রহিত করে "আন্তর্জাতিক আইনে" রাষ্ট্র শাসন করতে এসেছে। শত্রুতা ও মিত্রতা তথা, ওয়ালা-বারা'র নীতিও তারা পাল্টে দিয়েছে। এর স্থানে নিয়ে এসেছে "নাগরিক অধিকার, সহাবস্থান ও জাতীয় ঐক্য"। ফলে তারা দ্বীনের পরিবর্তে দেশকেই সম্পর্ক নির্ণয়ের ভিত্তি বানিয়েছে! যেখানে "সিরিয়া কেবল সিরিয়ানদের জন্য" এবং হারবী কাফেরদের জন্যও সমান নাগরিক অধিকার প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে অ-সিরিয়ান কেউ মুসলিম হলেও এই অধিকার পাবে না। কি এক অন্যায় বিভাজন!

'আদুও আশ-শারা' (তথা, আহমদ শারা) চেষ্টা করছে আর কিছু দূর এগিয়ে 'মুহাম্মদ বিন নাসীর' এর সাথে মিলিত হওয়া যায় কিনা। কিন্তু দ্বিতীয় জনের অনুসারীরা কোন ভাবেই এটা মানতে পারছে না। ফলে "সহাবস্থান ও জাতীয় ঐক্যের" স্বপ্নগুলো প্রথম ধাক্কাতেই ধ্বসে পড়ে। সে সাথে ধ্বসে পড়ে নব্য তাগুতের মতাদর্শগুলিও, -যে তার দ্বীন পরিবর্তন করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পুতুলে পরিণত হয়েছে। তারা পুতুলটিকে "অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট" পদে বসিয়েছে যেন নিজেদের ইচ্ছেমতো অঞ্চলটিকে পুনর্বিন্যাস ও বিভাজন করে নিতে পারে।

সম্প্রতি সিরিয়ার তাগুত "সিরিয়া কেবল সিরিয়ানদের জন্য" এই জাহেলী বিভাজন নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ উঠেপড়ে লেগেছিলো। যার ফলে সে তার অ-সিরিয়ান যোদ্ধাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং কাফের "সংখ্যালঘুদের" অধিকার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। এবং সিরিয়ার সমস্ত ধর্ম, শ্রেণি ও মতাদর্শের লোকদেরকে এক কাতারে রেখে এই স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করার চেষ্টা চালাতে থাকে। যার ফলে সিরিয়ার উপকূল অগ্নিগর্ভে পরিণত হয় এবং সে নিজেও এতে ঝলসে যায়! নিশ্চয়ই তাদের সাথে সহাবস্থানের এই নীতি এক জাহেলী ও ব্যর্থ নীতি, যা ইসলামের মানহাজ থেকে বহু দূরে। কেননা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মানদণ্ডে সিরিয়ানদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বৈধতা ইসলাম দেয় না, এবং ইসলাম কখনো একজন মুসলিম ও সিরিয়ান নুসাইরী-আলাভীকে সমান চোখে দেখে না। হ্যাঁ, কাফেররা সবাই সমান, তবে মুসলিমদের সাথে নয়।

এদিকে ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে মানুষের মাঝে একটি স্থূল চিন্তার উদয় হয়েছে যা অত্যন্ত বিপদজনক। এখন মানুষের সামনে "আহলে সুন্নাহ"র পরিভাষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং এই নামের মধ্যে যে আকীদা ও শরীয়াহর উপস্থিতি রয়েছে তা বাদ দিয়ে একে সিরিয়ার অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ও

সংখ্যালঘুদের বিপরীতে একটি নিছক জাতীগোষ্ঠী হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে! ফলে কিছু মানুষ এমন দাবী ও প্রস্তাবনা পেশ করছে যে, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর হুমকি মোকাবেলায় আহলে সুন্নাহ'র হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হোক। বস্তুত ইসলামিক আইন অনুসারে "সুন্নী বা আহলুস সুন্নাহ" হল তারা, যারা ইসলামের সহীহ আক্বীদা লালন করে এবং এর যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলে। সুতরাং, যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নেই, তারা "আহলে সুন্নাহ"এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আর তাদেরকে অস্ত্র-সজ্জিত করার আগে আক্বীদা-সজ্জিত করা জরুরী। অন্যথায় একসময় তারা "জূলানী"র মতো জাতীয়তাবাদী যোদ্ধা হয়ে উঠবে, যে কি-না কুফরি "সংবিধানের ঘোষণা"কে একটি "ঐতিহাসিক দিন" হিসেবে আখ্যা দেয় এবং এই সংবিধান রক্ষার্থে যুদ্ধ করে জীবন দেয়!!

সিরিয়ার এই প্রেক্ষাপটে আরো একটি অসংগতি হলো এই পরিস্থিতিকে "সাম্প্রদায়িক" সংঘাত নামে অবহিত করা। এটি একটি জাহেলী পরিভাষা, যা "আন্তর্জাতিক চুক্তি" ও ইখওয়ানীদের বিকৃত সিরাতগ্রন্থ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এ ধরণের পরিভাষা "মিল্লাতে ইবরাহীম" এর সাথে সাংঘর্ষিক -যা নিজেদেরকে সমস্ত কুফরী গোষ্ঠী থেকে মুক্ত ঘোষণা করে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং ইসলামি বিধান অনুসারে তাদের উপর হুকুম সাব্যস্ত করে; হারবী হলে হারবীর বিধান, যিম্মী হলে যিম্মীর বিধান। ফলে, কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কখনোই সাম্প্রদায়িক সংঘাত নয়। বরং এটি এমন এক আক্বীদা-বিশ্বাসের সংঘাত -যার উৎস কুরআন ও সুন্নাহ -যা খাইরুল কুরুন (তথা, শ্রেষ্ঠতম শতাব্দী) থেকে চলে আসছে।

এর সাথে যুক্ত হয় "কুর্দি মিলিশিয়াদের" প্রতি সিরিয়ার নতুন সরকারের গুণ্ডা বাহিনীর বিরোধপূর্ণ আচরণ; যারা রাতের বেলায়ও তাদেরকে ইহুদী ও আমেরিকার তৈরী বলেছিলো, কিন্তু সকাল হতেই তারা হয়ে গেলো রাজনৈতিক অংশীদার, মিত্রপক্ষ ও দেশপ্রেমী নাগরিক! সবই বিদেশী চাপের প্রভাব; ঠিক নুসাইরী সরকারের গুণ্ডাবাহিনীর মতো। বস্তুত প্রত্যেক সরকারের পেছনেই থাকে বাইরের কোনো শক্তি বা দেশ, যারা তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের স্বার্থ সাধনের জন্য সাহায্য প্রদান করে।

এই যে শামের ভূমিতে জাহেলী পতাকা ও শাসনব্যবস্থাগুলো একে অপরের সাথে জোট বেঁধে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে, এতে মুসলিমদের করণীয় হবে, এসব নব্য জাহিলিয়াত থেকে নিজেকে একেবারে আলাদা করে নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। অতঃপর, কথা ও কাজের মাধ্যমে এই সম্পর্কহীনতার প্রমাণ দেখাবে। মুমিনদের সাথেই কেবল মিত্রতা করবে এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে -সংখ্যায় তার কম-বেশি যাই হোকনা কেন। অপরদিকে কাফের ও মুরতাদদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার জিহাদ চালিয়ে যাবে।

﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

{আর যে আল্লাহ, তার রাসূল ও মুমিনগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।